সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার

সম্পাদনায়

ড. তপন মণ্ডল
ড. রাধেশ্যাম সাহা
ড. দীপঙ্কর মল্লিক

ড. অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়
ড. সুব্রত ঘোষ
ড. মিতালী গঙ্গোপাধ্যায়

Literature, Society and Culture
Tradition and Modern Approaches
Vol. 2
Edited by *Mondal, Bandopadhyay, Saha, Ghosh, Mallikm Gangopadhyay*

Published by *Gouri Publishing House*
44/1A Beniatola Lane, Kolkata-700009
Phone : 98304 44918/28
e-mail : gouripublishinghouse@gmail.com

ISBN : 978-93-87003-29-3

প্রথম প্রকাশ
৭ মার্চ ২০২০

মূল্য : ১৬০ টাকা

সূচি

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য

চৈতন্যজীবনী সাহিত্যে নিত্যানন্দের অবস্থান/বিশ্বনাথ পাহাড়ী ১১১
বৈষ্ণব কবিতা-অনুসন্ধান ও প্রামাণিকতা বিচার/অরীন্দ্রজিৎ ব্যানার্জি ২১৪
কৃষি ও কৃষক : রামেশ্বরের 'শিবসংকীর্তন পালা'য়/কৌশিক ঘোষ ১১৬
নাথ সাহিত্যের জীবন ও সংস্কৃতি/সন্দীপ কুমার সার্দুল ১২১
বাংলা সাহিত্য-সমুদ্রের একটি শাখা-নদী : 'যোগাদ্যা-সাহিত্য'/সৌম্যজিৎ চৌধুরী ১৮৮

লোকায়ত সংস্কৃতি ও সাহিত্য

টুনটুনির বই—উপকথার কথারূপ/সোমদত্তা ঘোষ (কর) ২৯
বাউলের পূর্বস্বর উত্তরবঙ্গের তন্ত্রমন্ত্রের গান তুক্‌খা/সুধাংশু কুমার সরকার ১৬৩
প্রবাদে নারীর মন : পরম্পরার উত্তরাধিকার/শিখা ঘোষ ২০
ছড়া : লোকায়ত পাঠ/পুষ্পেন্দু মজুমদার ২১১
লিঙ্গবৈষম্য ও পিতৃতন্ত্রে অন্তরালে সৃষ্ট নব লোকসংস্কৃতি/সুমন্ত ঘোষ ৯৮
লোকায়ত সুন্দরবনের মনসার ভাসান গান : ঐতিহ্য ও বিশেষত্ব/দীপ্ত সরদার ৪৪
সাউরিয়া পাহাড়িয়া আদিবাসীগোষ্ঠী/বিকাশ পাহাড়ী ১২৫
বঙ্গ সংস্কৃতিতে প্রাগার্য উপাদান, উপকরণ ও প্রভাব/গৌতম দাস ১৭২

কাব্য-কবিতা

কবি মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' : নামকরণ প্রসঙ্গ/অর্ণব সাধুখাঁ ১২
শঙ্খ ঘোষের কবিতায় কালচেতনা/রঞ্জন নায়ক ৩৮
কবিতা সিংহের কবিতা : ব্রাত্য নারীর আত্মনির্মাণ কথা/গালিব উদ্দিন মণ্ডল ১৬৮
কথামানবীর কথকতা : কবি মল্লিকা সেনগুপ্তের কলমে/সুস্মিতা সাহা ১৬০
মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় ইকোফেমিনিজম/তাপস পাল ১২৪
দেশভাগ : বাংলা কবিতার দর্পণে/মিঠু মণ্ডল ৯৪
বীজের খোঁজে, প্রসঙ্গ কাব্যচর্চা/পূজা বিশ্বাস ৮৬

উপন্যাস

বিধবা সমস্যার পরম্পরা : 'বিষবৃক্ষ' ও 'চোখের বালি'/কাকলি মোদক ২০৮
শকুন্তলা-মিরন্দা-দেসদিমোনা ও শৈবলিনী/পুষ্পা মণ্ডল ২১৮
'চোখের বালি' : বিনোদিনীর প্রেম, বিনোদিনীর প্রত্যাশা/শ্রেয়সী বোস ১

শঙ্খ ঘোষের কবিতায় কালচেতনা

রঞ্জন নায়ক

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের গর্ভ থেকে উঠে আসে স্রষ্টা। কিন্তু স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিকে নির্দিষ্ট দেশ-কাল কিংবা সমাজগণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না। অতীতকে মনে রেখে বর্তমানে দাঁড়িয়ে এক অনাদি ভবিষ্যতের পথে সৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁর লক্ষ। এই অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বা দেশ-কাল-পাত্রের গণ্ডি ছেড়ে সৃষ্টি যে শুধুই এগিয়ে যায় তা নয়, স্রষ্টাও এগিয়ে চলে সৃষ্টির প্রদীপ হাতে নিয়ে নিজেকে উন্মোচন করতে করতে। নিজের খোলস ভেঙে মানুষের এই আত্মসচেতন বিস্তারের ইচ্ছে একদিকে যেমন বিশ্বের সঙ্গে আমির সংযোগ ঘটায় অন্যদিকে রবার্ট পেন ওয়ারেনের ভাষায় ঘটায় "Chronological time and history" র যোগ।

দুই

রবীন্দ্র পরবর্তী আধুনিক কবিদের মধ্যে প্রথম জীবনানন্দের কবিতায় উঠে আসে পরিচ্ছন্ন কাল-জ্ঞান। জীবনানন্দ কবিতায় ইতিহাসচেতনা বা কালচেতনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁর 'উত্তর রৈবিক বাংলা কাব্য' নামক প্রবন্ধে বলেছেন, "কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান। কাল বা সময় বৈনাশিক, কিন্তু সে সেই সমস্ত কুয়াশাগুলোকেই কেটে কেটে চলছে যা পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপ্তি বাড়াবার পক্ষে অন্তরায়ের মতো।"[১] পাশ্চাত্য কবি এলিয়টের কাব্যেও এক ধরনের কাল-চেতনা লক্ষ করা যায়। এলিয়ট ব্যক্তি নয় নৈর্ব্যক্তিকতায় বিশ্বাসী। তাঁর সমস্ত কাব্য কবিতার সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে প্রকৃত অথবা কল্পিত, সম্পূর্ণ অথবা খণ্ডিত যাত্রার প্রসঙ্গ ও বিবরণ। বোধহয় সেই জন্যই এলিয়ট হয়ে উঠেছিলেন এক আন্তর্জাতিক কবি ব্যক্তিত্ব।

তিন

এ যুগের কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতায়ও কাল-চেতনা এক অনন্য মাত্রা বহন করে। বর্তমান পৃথিবীর এক ঘোরতর সমস্যা হল মানুষের সত্তার সমস্যা। আর এই সমস্যাই বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে শঙ্খ ঘোষের কবিতায়। মানুষের এই সত্তা দেশ দিয়ে ঘেরা। আবার সেই দেশ কালে বিন্যস্ত। একটু ভালো করে দেখলে বোঝা যায় অপেক্ষমান, পরিবর্তমান, নিত্য জায়মান যে অস্তিত্বের ছবি, সেই ছবি গড়ে উঠে দেশ কালের এই বিন্যাসে। তাই দেশগতভাবে 'আমি আর না আমির' জটিল টানাপোড়েনে এগিয়ে আসে অস্তি এবং বিচ্ছিন্ন একটা মুহূর্তও একাকী বিরাজ করে না। তার পরিপূর্ণতা গড়ে ওঠে সুবিশাল কালস্রোতের অংশ হিসেবে। সকলের সঙ্গে কবিকে পথ চলতে হয়। সকলের জীবনের অংশ ভাগ হয়েই নির্মিত হয় কবির ব্যক্তিত্ব। শুধু নিজেকে নিয়ে নয়, সমগ্র সত্তার মধ্য দিয়ে জীবনকে পেতে চান যে কবি, বিশ্বকে তিনি

দেখেন সমগ্র রূপে। সেই দেখা থেকে জন্ম নেয় সৃষ্টির বীজ। তাই কবি শঙ্খ ঘোষের কবিজীবনের সূত্রপাত মুহূর্তেই শোনা যায়—

> আনন্দে চিরায়ু চাও, লগ্ন তুমি প্রত্যহের স্রোতে।.../উপরে আকাশ ঢাকে প্রকাণ্ড ডালায় বসুধারা/নিচে খুলে খুলে যায় সব তুচ্ছ সবুজের মুঠি...। (ধানে গানে বসুধায়)

অন্তরের কথা যেমন বাইরে আসে বাইরের ঘটনাও অন্তরে এসে এক সৃষ্টির মুহূর্ত তৈরি করে, তেমনি প্রত্যহের স্রোত বয়ে চলে চিরন্তন বা চিরায়ুর দিকে। ভেঙে যায় সীমাবদ্ধতার বেড়া। কবি শঙ্খ ঘোষ একেই কবিতার মুহূর্ত বলেছেন। তাঁর কথায়—"এই সব মুহূর্ত হলো অতীত ভবিষ্যৎ আর বর্তমানের মিলন মুহূর্ত, নিমেষের মধ্যে সময়টিকে তখন ভাবী কালের দিকে সরিয়ে নিয়ে অতীত হিসেবে ভাবতে পারা যায়।"[২] অতীত বর্তমানের সঙ্গে মিশে থাকে বর্তমানকে ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপটে অতীত বলে ভাবা যায়। এইভাবে কালের চিরচঞ্চল গতি একটা মুহূর্তে এসে সংহত হয়—

> প্রতিটি মুহূর্ত যেন লেগে থাকে প্রাচীন স্ফটিক/সীমান্ত পেরিয়ে যেই পার হই প্রথম খিলান/ঘর থেকে ঘর আর হাজার দুয়ার যায় খুলে। (পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ)

এই ভাবে কবি সৃষ্টির হাজার দুয়ার খুলতে খুলতে পা বাড়ান এক অনাদি কালের দিকে। যেখানে মিলে যায় দৈনন্দিন চিরন্তন, এক হয়ে যায় প্রত্যক্ষ কাল আর ধারণা কাল। 'মণিকর্ণিকা' কবিতায় দেখি কবি বলছেন—

> দিনের বেলা যাকে দেখেছিলে চণ্ডাল/আর রাত্রিবেলা এই আমাদের মাঝি/কোনো ভেদ নেই এদের চোখের তারায়...

এইভাবে কবি যেন এগিয়ে যান সামনের দিকে, আরো সামনের দিকে। যেখানে পরিবার পরিজন দূরে চলে যায়, প্রিয় মানুষের কণ্ঠ বাতাসে বিলীন হয়ে যায়, কবি একা একা পথ হাঁটেন মহাসময়ের শূন্যতলে—

> ঘর যায় পথ যায় প্রিয় যায় পরিচিত যায়/সমস্ত মিলায়/এমন মুহূর্ত আসে যেন তুমি একা/দাঁড়িয়েছ মুহূর্তের টিলার উপরে, আর জল/সব ধারে ধাবমান জল/প্লাবন করেছে সত্তা ঘরহীন পথহীন প্রিয়হীন পরিচিতহীন/আর, তুমি একা/এত ছোটো দুটি হাত স্তব্ধ করে ধরেছ করোটি/মহাসময়ের শূন্যতলে...(অঞ্জলি)

কবি যেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা জীবনানন্দের মতো পথে নেমেছেন। যে পথ 'বনলতা সেনে'র কথক কবি বা 'পথের পাঁচালী'র অপুর পথের মতোই সংগ্রামে পরিপূর্ণ অথচ মধুর। তাই 'ত্যাগ' কবিতায় শোনা যায়—

> আমি খুব ভুল করে এ-রকম বৃষ্টিময় দিনে/ঘর ছেড়ে পথে যাই, পথ ছেড়ে আনন্দ নদীর/নদী চায় আরো ত্যাগ পৃথিবীর সীমানা অবধি/ধারাময় হয়ে যায় আমাদের নির্ভার জীবন/যা-কিছু কলঙ্ক ছিল শূন্যে শূন্যে ধুয়ে যায় যেন/কেবল জলের ভারে মাথা নিচু করে বলে জবা,/ও কি তবে ভুল করে ঘরের বিষাদ গেল ভুলে?

কবির শৈশব, কৈশোর বা যৌবন দেখলে বোঝা যায়, কবির এই জীবনপথ এগিয়ে চলেছিল পদ্মাতীর থেকে কলকাতায়, সহজ সরল জীবন থেকে ক্রমশ জটিল জীবনের দিকে। এই বিস্তৃত জীবন অভিজ্ঞতার পটে ফুটে উঠেছে কবির সৃষ্টি, যাকে কবিতার মুহূর্ত বললে খুব একটা ভুল বলা হয় না। কবি তাই বলেন—

কী ছিল বয়স কী ছিল হৃদয়, তখন/পদ্মা আমাকে দিয়ে দিয়েছিল বিদায়/আজ মনে জানি তুমি নও তুমি নও/আমিই আমাকে ছেড়েছি মধ্যরাতে। (একা)

এ ছাড়া শুধু নিসর্গ প্রকৃতিকে ছেড়ে আসা নয়, এ যে নিজের শিকড় ছিঁড়ে আসা। তাই সেদিনের দেশ ছেড়ে পালানোর লজ্জা পরে গ্লানিতে ভরে যায়। তাই তিনি ১৯৭১-এ বাংলাদেশ জয়ে লিখতে বাধ্য হন—

আজ তোমার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে চাই জয়/কিন্তু সে কথা বলা আমার সাজে না.../আবার বুকে পালানোর পালানোর আরো পালানোর দেশজোড়া স্মৃতি/ডানায় জড়ানো শূন্যে হারানো গলার স্বর খুঁজে মরে একা মধ্যরাত। (হারানো গলার স্বর)

এক নিমেষেই কবির হাতে ধরা দেয় মহাসময়। যে কোন সাধারণের মধ্যে থাকে অসাধারণের দ্যোতনা, যে কোন তুচ্ছের মধ্যে থাকে মহতের সম্ভাবনা। শঙ্খ ঘোষের 'কবিতার মুহূর্ত' পাঠ করলে দেখা যায় "ছোটো হয়ে নেমে পড়ুন মশাই"[৩] বাস যাত্রীর এই পরামর্শ শুনে কবির মনে সহসা জিজ্ঞাসা জাগে—

আরো কত ছোটো হব ঈশ্বর/ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালে।/আমি কি নিত্য আমারও সমান/সদরে, বাজারে আড়ালে? (ভিড়)

শঙ্খ ঘোষ নিজেই বলেছেন, "কথাগুলি যেন স্তর থেকে স্তরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে, ভিড় থেকে দূরে একারই কোনো কেন্দ্রে, নিজের একেবারে মুখোমুখি।"[৪] 'পিছনের দিকে এগিয়ে চলুন' বাস কনডাক্টরের এই হাঁকের মধ্যেও রণিত হয় গভীর ব্যঞ্জনা, ফুটে ওঠে আমাদের সমাজের বর্তমান পরিস্থিতি।

অতীত থেকে বর্তমান আসে, বর্তমান এগিয়ে চলে ভবিষ্যতের দিকে। কাল প্রবাহ যেন এক পথ। অপুর মতোই কবিও যেন পথ-দেবতার 'চরৈবেতি' মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে এগিয়ে চলেছেন উত্তরণের দিকে। এই মুক্তির পথ, উত্তরণের পথ কাল থেকে কালাতীত। দিনানুদিন থেকে চিরন্তনের পথের কথা বার বার মেলে তাঁর কবিতায়। যেমন, 'পথে পথে উল্লাস অথই যাকে', কিংবা 'ধুলোয় ধুলোয় ছড়িয়ে আছে দুয়ার হারা পথ'।

বাইরের পৃথিবী ও ব্যক্তিগত জগতের মধ্যে নিরন্তর আসা যাওয়ায় গড়ে ওঠে তৃতীয় এক সত্তা। কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতায় ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্যে বর্তমানের মধ্যেই অতীত জেগে থাকে। এই বর্তমান ও অতীত এক হয়ে ধরা দেয় তাঁর কবিতায়—

জলের উপর ভাসে আমার ছেড়ে আসা/সারিবাঁধা বদর বদর ডাক/বেজে উঠল অনেক দিনের ঢাক। (বেজে উঠল ঢাক)

এইভাবে সঞ্চিত স্মৃতি এক অসামান্যরূপ লাভ করে বর্তমানের পটভূমিতে।

সময় সচেতন কবি কখনো নিজের যুগ বা কালকে এড়িয়ে যেতে পারে না। পৈশাচিক সভ্যতায় দাঁড়িয়ে কবি প্রত্যক্ষ করলেন এক নিষ্ঠুর সময়কে। যে সময় মানুষের মধ্যে থেকে একে একে করে ছিনিয়ে নিচ্ছে স্নেহ, প্রেম ভালোবাসা। যে সময়ের হাত ধরে বর্তমান পৃথিবীতে জন্ম নিচ্ছে হিংসা, বিদ্বেষ, দম্ভ আর অহঙ্কার। হয়তো জীবনানন্দ একেই বলেছেন পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ বলে। এই অসুস্থ সভ্যতার রূপ একে একে ধরা দেয় শঙ্খ ঘোষের অনেক কবিতায়। 'দেশ আমাদের আজও কোনো' কবিতায় পাওয়া যায় এই জীর্ণ সভ্যতার বিবর্ণ রূপ। কবি শুধু নিজের দেশ নয়, সারা পৃথিবীর কথা বললেন। দেশের রূপকে বর্তমান

পৃথিবীর সংকটকেই তুলে ধরলেন কবি। আবার 'যমুনাবতী' কবিতায় দেখা যায় শোষক শ্রেণির নির্মম অত্যাচার। যেখানে দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের করা আন্দোলনকে দমন করার জন্য শিকার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে গ্রামবাংলার এক সাধারণ মেয়ে 'যমুনাবতী'কে। তিল তিল করে গড়া তার সুখের স্বপ্ন ভেঙে গেছে নেকড়েরূপী অত্যাচারীর ধার চকচকে থাবার আঘাতে। তাই কবি এই শোষক শ্রেণিকে চিহ্নিত করে বলেন—"বর্গি না টর্গি না, যমকে কে সামলায়!/ধার-চকচকে থাবা দেখছ না হামলায়?/যাস্নে ও হামলায় যাসনে!" তার পরেই কবি তুলে ধরেন শোষকের নখের আঁচড়ে প্রাণ দেওয়া সাধারণ মেয়ের অসাধারণ কাহিনি—

> নেকড়ে ওজর মৃত্যু এল/মৃত্যুরই গান গা/মায়ের চোখে বাপের চোখে দু তিনটে গঙ্গা।/দুর্বা'তে তার রক্ত লেগে/সহস্র সঙ্গী/জাগে ধক্ ধক্ যজ্ঞে ঢালে/সহস্র মন ঘি!

বারুদ বুকে নিয়ে সে রচনা করে তার বাসর। কবির কথায় 'যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে'। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, জীবনের মানে বাঁচার ইঙ্গিতে। তাই কবি আমাদের বলে যান, 'নিভন্ত এই চুল্লিতে বোন আগুন ফলেছে'। এখানেই কবি হয়ে উঠেছেন একই সঙ্গে স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা, যিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন ভবিষ্যৎ পথের। বর্তমান সমাজে অর্থহীন দরিদ্র মানুষদের কোনো মূল্য নেই। বিত্তবানের কাছে তারা যেন কঙ্কাল সার ভিখারি। লুণ্ঠনে, শোষণে, ভ্রষ্টাচারে আত্মপরিচয়হীন ভিখারি এই দেশ, ভিখারি এই দেশের মানুষ। সীমাহীন অত্যাচারের শিকার মানুষের প্রতি মর্মবেদনায় শঙ্খ ঘোষের কবিতায় বারে বারে উঠে আসে ভিখারির চিত্রকল্প। যেমন—

> আঁকিবুকি গলি, পথ, দোকান পসার, ছোটো সিঁড়ি/অন্ধকার ভিজে ঘর কুঁকড়ে থাকে মলিন ভিখিরি... (সকাল দুপুর সন্ধ্যা)

আমরা দেখি পথের ভিখিরি মাকে, ক্র্যাচে ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। দেখি সেই ভিখিরি মেয়েকে যে কবির মেয়ের সঙ্গে মমত্ববোধে একাকার হয়ে যায়—"সি আই টি রোডের বাঁকে পাথরকুচির উপর/হাত ছড়িয়ে দিয়ে/ঘুমিয়ে আছে আমার মেয়ে/বুকের কাছে এনামেলের বাটি।" ('ভয়')

কবি ভিখারি মেয়ের সঙ্গে যেমন নিজের মেয়েকে মিলিয়ে দেন, তেমনি নিজেকেও কখনো কখনো মিলিয়ে নেন ভিখারির সঙ্গে।

> নিচু হয়ে বসে আছি পথের কিনারে, হাতে বাটি/যাওয়া আসা করে লোক, স্রোত আছে মনোবল নেই। (ভিখিরি)

কিন্তু মনোবল লুপ্ত হয় না। ভিখারি হয়েই কবি গৃহস্থের কানে কথা বলতে চান, ভাঙতে চান তার সব স্থবিরতা। ভিখারির মধ্যেও থাকে জয়, ভিখারিও বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করে না তার পরিস্থিতির। কবির কথায় স্থবিরতা। ভিখারির মধ্যেও থাকে জয়, ভিখারিও বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করেনা তার পরিস্থিতির। কবির কথায়—"বাতুল দুপুরে ডুগডুগি নিয়ে/ গান গেয়ে যায় ভিখারি বালক।" নারকীয় শহরের মধ্যে এই গানে বেঁচে থাকে জীবন, জীবনের উত্তরণ। তার মুখে উচ্চারিত করেন কবি অন্যায় পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করার মরিয়া প্রতিবাদ। যেমন—

আমি ত বুঝেও এমন
বেহারা শরমখাকী

খুঁটে খাই যখন যা পাই
সুবোদের পায়ের তলায়
খেতে তো হবেই বাবা
না খেয়ে মরব না কি। ('লজ্জা')

যারা সহজে কোনো কিছু পায়না তারাই বোঝে না পাওয়ার বেদনা। আর এই বেদনা থেকে বেরিয়ে আসে চরম প্রতিবাদ। ভিখিরির এই প্রতিবাদ শুধু নির্দিষ্ট দেশ কালের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, পৃথিবীর প্রতিটি দেশে প্রতিটি কালে বয়ে চলে এই না পাওয়া মানুষের প্রতিবাদ। এ প্রতিবাদ 'বাংলা থেকে কিউবা থেকে ঘানা'। আবার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সুন্দর মেলবন্ধন পাওয়া যায় 'বাবরের প্রার্থনা' কবিতায়। যেখানে কবি কখনো নিরাসক্ত ঐতিহাসিক আবার কখনো নিজেই ইতিহাসের চরিত্র হয়ে উঠেছেন। 'অন্নদামঙ্গাল' কাব্যের ঈশ্বরী পাটনীর মতো পৃথিবীর প্রত্যেক পিতার কামনা-'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'। কিন্তু বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতা সেই সন্তানকে কেড়ে নেয় তার পিতার কাছ থেকে। তাই কবিও ঈশ্বরের কাছে বাবরের মতো নিজের জীবনের বিনিময়ে সন্তানের মঙ্গাল প্রার্থনা করেন। একটু ভালো করে দেখলে বোঝা যায়, এখানে এই ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতা হয়ে উঠেছে অসুস্থ পুত্র আর কবি স্বয়ং হয়ে উঠেছেন সেই পুত্রের পিতা, যিনি চাইছেন প্রয়োজনে আত্মবলি দিয়েও সমাজ ও সংসারের এই ক্ষয় রোধ করতে। তাই কবি কখনো উচ্চারণ করেন—

আমারই হাতে এত দিয়েছ সম্ভার
জীর্ণ করে ওকে কোথায় নেবে
ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

দেশ নিহিত সময়কে দেশোত্তর সময়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবার প্রয়োজনে শঙ্খ ঘোষ আরো অনেক কবির মতো পুরাণের আশ্রয় নেন। প্রত্যক্ষ কাল থেকে ধারণা কালে যেতে হলে পুরাণ হয়ে ওঠে এক নিশ্চিত অবলম্বন। পুরাণ বর্তমান পরিস্থিতিকে উজ্জ্বল করে তোলে। পুরাণের মধ্যে বর্তমানের সংকীর্ণতা কালাতীত পটভূমি পায়। সর্বনাশা ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে কবি অনুভব করেন—"আজ দেশ জোড়া বারণাবতের/প্রস্তুত সব জতুগৃহ।" নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশের আয়োজন করেছি, জতুগৃহদাহের চক্রান্ত করেছি। তাই কবি বলছেন—

> মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছি লাক্ষা/কোথাও ধর্ম কোথাও রাজ্য/চর্বিতে শণে তেলে আর কাঠে/ঘৃণা বিচ্ছেদে দলে উপদলে/স্ফুলিঙ্গাপাতে সহজে দাহ্য/বিদুরেরা শুধু নেই কোথাও। (জতুগৃহ)

আবার বিহারের আরওয়ালের কুখ্যাত হত্যাকাণ্ড শুধু নিকট অতীতের জালিয়ানওয়ালা-বাগের কথা কবিকে মনে করিয়ে দেয় না, এক ঝলকে চলে আসে মহাভারতের পুরাণ প্রসঙ্গ। বর্তমানের মধ্যে অতীত আর অতীতের মধ্যে বর্তমান রণিত হতে থাকে। 'অন্ধবিলাপ' কবিতায় দেখি পুরাণের পুনর্নির্মাণ। অতীত বর্তমান একাকার হয়ে চলে যায় ভবিষ্যতের দিকে। উৎপীড়িত মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকে, অত্যাচারী দুঃস্বপ্ন দেখে-'ধানজমিতে ঘাসজমিতে সমবেত লোকজনেরা/ধেয়ে আসছে সামন্তদের...'। বিলাপরত অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র তো ব্যাসকে বলেছিল

ভবিতব্য এটাই আমার, নিজের পাপেই হবে বংশের সমূহ সর্বনাশ। 'রক্তকরবী'র রাজার মতোই এই ধৃতরাষ্ট্র পক্ষ পরিবর্তন করে। 'রক্তকরবী'র রাজা জালাবরণ ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছিল, ভেঙে ফেলেছিল ধ্বজার দণ্ড, আর অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বলেন—

আমার পাপেই উশকে উঠুক মহেশ্বরের প্রলয়পিনাক
সর্বনাশের সীমায় সবাই যায় যদি তো শেষ হয়ে যাক...। (অন্ধবিলাপ)

এমন ব্যঞ্জনাময় পুরাণ যখন বর্তমান সংকটময় মুহূর্তের কবিতায় স্পন্দিত হতে থাকে, বর্তমানের মধ্যে তখন অতীত আর জীর্ণভার হয়ে থাকে না, হয়ে ওঠে এক সঞ্জীবিত প্রবাহ। শঙ্খ ঘোষ তাঁর কবিতায় শুধু ভাব নয়, ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়েও কালকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছেন। 'কবিতা ও তার পাঠক' প্রবন্ধে শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন "কবি কখনোই ভুলে যান না যে একহাতে এই দেশ নিহিতকাল আর অন্যহাতে দেশোত্তর কাল ধারণ করার মুহূর্তেও তিনি পা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন অস্থির সমসময়ের সংকটের উপর।"[৫] তিনি যে সমসময়ের উপর পা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন তার সব থেকে বড়ো প্রমাণ তিনি সমসময়ের ভাষাকে কবিতার ভাষা হিসাবে নির্বাচন করেন। সমকালের ভাষায় থাকে চলতিকালের চাঞ্চল্য, তারই মধ্যে কবি সঞ্চারিত করেন চিরন্তনতার স্পন্দন।

চার

শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'এ আমির আবরণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সংগীতের চিরকালীনতা প্রমাণ করতে গিয়ে 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমুকে বলা বিপ্র দাসের দুটি উক্তির কথা স্মরণ করেছেন,

সংসারে ক্ষুদ্র কালটাই সত্য হয়ে দেখা দেয় কুমু, চিরকালটা থাকে আড়ালে;
গানে চিরকালটাই আসে, ক্ষুদ্র কালটা যায় তুচ্ছ হয়ে, তাতেই মন মুক্তি পায়।

ঠিক তেমনভাবে দৈনন্দিনতার উপরে দাঁড়িয়ে, ক্ষুদ্র কালের গণ্ডির মধ্যে দাঁড়িয়ে শঙ্খ ঘোষের কবিতা গানের মতো নিজেকে প্রসারিত করে দেয় চিরকালের দিকে। সময়ের দেশ চলে আসে সময়াতীত দেশোত্তর পটভূমিতে। জীবনানন্দের মতো তিনিও লক্ষে আনতে চান প্রত্যহের অতীত একটা ভূমিকে, প্রতিদিনকে তিনি দেখতে চান তার সমগ্রের পটে; তার গাঢ়তর বোধে। সেই সমগ্রতার জন্যই স্মৃতিময় অতীত, সংকটাপন্ন বর্তমান আর প্রত্যাশাময় ভবিষ্যৎ মিশে যায়।

উৎসের সন্ধানে

১. জীবনানন্দ দাশ : 'কবিতার কথা', সিগনেট প্রেস, নবপর্যায় সিগনেট প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৫, প্রবন্ধ-উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য, পৃ. ৩২
২. শঙ্খ ঘোষ : 'কবিতার মুহূর্ত', অনুষ্টুপ, সপ্তম মুদ্রণ, পৌষ ১৪২১, ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ. ৪৫
৩. তদেব, পৃ. ২৩
৪. তদেব, পৃ. ২৩
৫. শঙ্খ ঘোষ : 'বিশেষ সংখ্যা', অনুস্টুপ, সম্পাদক-অনিল আচার্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক অষ্টবিংশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা ১৯৯৪, কালের মাত্রা ও শঙ্খ ঘোষের কবিতা, অশ্রুকুমার সিকদার, পৃ. ৩০